হৃদযন্ত্রের যত কথা

ইউনিট ৩

ভূমিকা

পরিবহন জীবের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ব্যবস্থা। এ প্রক্রিয়াটি প্রতিনিয়ত জীবদেহে সংঘটিত হচ্ছে। মানবদেহে হৃদপিন্ডের মাধ্যমে রক্ত পরিবাহিত হয়। এই ইউনিটে হৃদযন্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৩.১ : রক্ত, রক্তের কাজ ও রক্তের গ্রুপ
পাঠ- ৩.২ : রক্তের উপাদান
পাঠ- ৩.৩ : রক্ত সঞ্চালন
পাঠ- ৩.৪ : হার্টবিট ও রক্তচাপ
পাঠ- ৩.৫ : হৃদ রোগ ও এর প্রতিকার এবং ডায়াবেটিস

পাঠ-৩.১ রক্ত, রক্তের কাজ ও রক্তের গ্রুপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রক্ত কী তা বলতে পারবেন;
- রক্তের কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন;
- রক্তের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রক্ত গ্রহণে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	রক্ত, রক্তগ্রুপ, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, Rh ফ্যাক্টর

দেহকে সচল ও কার্যক্রম রাখার জন্য দেহে যে সমস্ত তন্ত্র আছে, তার মধ্যে রক্ত সংবহনতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। এ তন্ত্রে প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমে পরিপাককৃত খাদ্যের সারাংশ অক্সিজেন এবং বজ্য পদার্থ প্রতিনিয়ত দেহের একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয়। এ পাঠে আমরা রক্ত, রক্তের কাজ এবং রক্তের গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করব।

রক্ত

রক্ত এক ধরনের তরল যোজক কলা। রক্তরস এবং কয়েক ধরনের রক্ত কণিকার সমন্বয়ে রক্ত গঠিত হয়। মানুষ ও অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণিদেহের রক্ত লাল রঙের হয়। লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক লৌহঘটিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকায় রক্তের রং লাল হয়। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে অক্সিজেন পরিবহন করে।

রক্তের কাজ

রক্ত দেহের বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। যথা–

- আমরা যে খাদ্য খাই, পরিপাকের পর তার সারাংশ রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়। রক্ত সেই খাদ্যসারকে দেহের সকল অংশে নিয়ে যায়। এভাবে জীবকোষগুলো পুষ্টি সাধন করে।
- রক্তের লোহিত কণিকাস্থ হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে ফুসফুস হতে দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছায় এবং কোষগুলো হতে কার্বন-ডাই অক্সাইড বহন করে এনে ফুসফুসের মাধ্যমে বাইরে বের করে দেয়।
- দেহের মধ্যে সর্বদাই দহনক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে। তাতে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে বিভিন্ন তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়, তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় এবং এভাবে দেহে তাপের সমতা রক্ষা পায়।
- নালীবিহীন গ্রন্থিগুলোতে অন্তঃনিসৃত রস সরাসরি রক্তে মিশে। এ রসকে হরমোন বলে। সঞ্চালিত রক্তের দ্বারা হরমোন প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ হয়।
- রক্তের শ্বেতকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় প্রবেশকৃত অবৈধ ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে।
- দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়।
- রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রকার দুষিত পদার্থ ও বর্জ্য উপাদান ফুসফুস, মূত্রাশয় ও ত্বকে নিয়ে আসে ও সেখান হতে তাদের নিষ্কাশন করতে সহায়তা করে।

রক্তের গ্রুপ

দেখতে একই রকম হলেও প্রকৃতপক্ষে সব রক্ত এক ধরনের নয়। একজনের রক্ত অন্যজনের রক্তের সাথে মিল নাও হতে পারে। রক্তের বিভিন্ন গ্রুপ আছে। যখন কোনো কারণে মানুষের দেহে রক্ত কমে যায় বা কোনো কারণে দেহে রক্তের প্রয়োজন পড়ে, তখন অবশ্যই তাকে রক্ত দিতে হবে। যাকে রক্ত দিতে হবে এবং যার শরীর থেকে দিতে হবে উভয় ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। উভয় ব্যক্তির রক্ত সম-বিভাগের হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দাতা-গ্রহিতার রক্তের মিল না হওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে গ্রহিতা মারা যেতে পারে।

১৯০০ সালে ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) ভিয়েনার একটি মেডিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় দেখতে পেয়েছিলেন, যখন কোনো ব্যক্তির রক্তকণিকা অন্য ব্যক্তির রক্তের সাথে মেশানো হচ্ছে, তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তকণিকাগুলো গুচ্ছবদ্ধ হচ্ছে। তিনি এটির উপর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উদঘাটন করেন, মানুষের রক্তকোষে দুই ধরনের অ্যান্টিজেন আছে এবং একইভাবে রক্তের সিরামে (Serum) দুই ধরনের অ্যান্টিবডি আছে।

সিরাম কী?

রক্ত জমাট বাধার পর রক্তের জমাট অংশ থেকে যে হালকা হলুদ বা খড়ের রঙের মতো এক রকম স্বচ্ছ রস নিঃসৃত হয়, তাকে সিরাম বলে। রক্তরস বা প্লাজমা এবং সিরামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– রক্তরসে রক্তকণিকা থাকে কিন্তু সিরামে কোনো রক্তকণিকা থাকে না।

বোঝার সুবিধার জন্য দুই ধরনের অ্যান্টিজেনকে 'A' এবং 'B' নামকরণ করা হয়। একজন মানুষ তার রক্তে এই দুটি অ্যান্টিজেনের মধ্যে যে কোনো একটি অথবা দুটিই ধারণ করে অথবা দুটির একটিও ধারণ করে না। রক্তের অ্যান্টিজেনের ভিত্তিতে পৃথিবীতে চার ধরনের মানুষ বিরাজ করছে। যে মানুষের রক্তকোষে A অ্যান্টিজেন থাকে, তাকে গ্রুপ 'A', যে মানুষের রক্তকোষে 'B' অ্যান্টিজেন থাকে তাকে গ্রুপ 'B', যে মানুষের রক্তে 'A' ও 'B' উভয় অ্যান্টিজেন থাকে তাকে AB গ্রুপ এবং যার মধ্যে 'A' ও 'B' অ্যান্টিজেনের কোনোটিই থাকে না, তাকে গ্রুপ 'O' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মানুষের রক্তকোষে যে ধরনের অ্যান্টিজেন থাকবে, ঠিক তার অনুরূপ অ্যান্টিবডি তার রক্ত সিরামে থাকবে না। এটি স্পষ্ট, যদি A অ্যান্টিজেন বহনকারী মানুষের সিরামে A অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধ অ্যান্টিবডি থাকতো তাহলে সে ব্যক্তির রক্ত গুচ্ছবদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হতো। সুতরাং একজন মানুষের রক্তের গ্রুপ A হলে তার রক্তে A অ্যান্টিজেন থাকবে। এর বিরুদ্ধে কোনো অ্যান্টিবডি থাকবে না, তার রক্তে কোনো B অ্যান্টিজেন নেই, কিন্তু B অ্যান্টিবডি থাকবে।

এভাবে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। যথা– A, B, AB ও O।

নিচে ABO রক্তগ্রুপের সম্পর্ক এবং রক্তদাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক দেখানো হলো।

রক্তের গ্রুপ	লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন	রক্তরসে অ্যান্টিজেন	যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারবে	যে গ্রুপের রক্ত গ্রহণ করতে পারবে
A	A	anti- B	A এবং AB	A এবং O
B	B	anti- A	B এবং AB	B এবং O
AB	A, B	কোনো অ্যান্টিবডি নেই	AB	A, B, AB এবং O
O	কোনো অ্যান্টিজেন নেই	anti- A anti- B উভয় আছে	A, B, AB এবং O	O

অ্যান্টিজেন লোহিত কণিকার প্লাজমা পর্দার বাইরে থাকে। অ্যান্টিবডি রক্তরসে থাকে।

উপরের ছক থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির রক্তে যে অ্যান্টিজেন নেই, শুধু সেই অ্যান্টিবডি সেখানে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ A রক্ত গ্রুপে A অ্যান্টিজেন, B রক্ত গ্রুপে B অ্যান্টিজেন এবং AB রক্ত গ্রুপে A ও B উভয়

অ্যান্টিজেন থাকে। এদের কোনোটিতে একই ধরনের অ্যান্টিবডি থাকে না। কিন্তু O রক্ত গ্রুপের রক্তে যেহেতু কোনো অ্যান্টিজেন নেই সেহেতু এর রক্তরসে anti A ও anti B উভয় অ্যান্টিবডি থাকে। A গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি B গ্রুপের লোহিত কণিকাকে গুচ্ছবদ্ধ করে জমিয়ে দেয়। অনুরূভাবে B গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি A গ্রুপের রক্তকে জমিয়ে দেয়। কিন্তু AB গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তকে জমাতে পারে না। কারণ এ গ্রুপের রক্তে কোনো অ্যান্টিবডি নেই। তাই O গ্রুপের রক্ত বহনকারী নিজের গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য কারও রক্ত নিতে পারবে না। সে কেবল O গ্রুপের রক্তই নিতে পারবে, কিন্তু দেওয়ার সময় সব গ্রুপকে রক্ত দিতে পারবে।

উপরের তালিকা থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে 'A' রক্ত গ্রুপের দাতা 'A' ও 'AB' রক্ত গ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারবে। তেমনি B রক্ত গ্রুপের দাতা B ও AB রক্ত গ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারবে। AB রক্ত গ্রুপের ব্যক্তিকে A, B, AB ও O অর্থাৎ এই চারটি গ্রুপের যে কোনো গ্রুপের রক্ত দেওয়া যায়। এ কারণে AB গ্রুপের রক্ত বহনকারীকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়। একইভাবে O গ্রুপের রক্ত যে কেউ নিতে পারে, তার জন্য কোনো রক্ত পরীক্ষার দরকার হয় না। এজন্য O গ্রুপের রক্ত বহনকারীকে সর্বজনীন দাতা বলা হয়।

- জানা ভাল রক্ত সঞ্চারণের সময় দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ যদি জানা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে O এবং Rh নেগেটিভ রক্ত সঞ্চায়ণ করাই শ্রেয়।
- রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে শিশুর পিতৃত্ব (কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয় কেবল কোনো নির্দিষ্ট রক্ত গ্রুপের ব্যক্তি) নির্ণয়ে জটিলতা সমাধান করা যায়।
- রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে অপরাধীদের শনাক্ত করা যায়।

Rh ফ্যাক্টর

রক্তে A, B ও ABO অ্যান্টিজেন ছাড়াও লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে আরও এক ধরনের অ্যান্টিজেন রয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত রেসাস (Rhesus) নামক এক প্রকার বানরের নাম অনুসারে এ অ্যান্টিজেনটির নাম রাখা হয় রেসাস ফেক্টর বা Rh factor। যেসব মানুষের রক্তে Rh factor উপস্থিত তাদের Rh^+ (Rh পজেটিভ) এবং যাদের রক্তে Rh factor অনুপস্থিত, তাদের Rh^- (Rh নেগেটিভ) বলে।

Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব (Importance of Rh Factor)

আকস্মিক রক্তপাত, দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় রোগীর দেহে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এ সময় জরুরীভিত্তিতে এ অভাব পূরণের জন্য রক্ত দান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রক্তদান কার্যে Rh (নেগটিভ) রক্ত যেরূপ সমস্যার সৃষ্টি করে Rh (পজেটিভ) রক্ত সেরূপ সমস্যার সৃষ্টি করে না। Rh পজেটিভ ধারী ব্যক্তির রক্তে অন্য ব্যক্তির রক্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু Rh নেগেটিভ রক্তের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। এমন ব্যক্তিকে Rh রক্তদান করলে রক্তের রক্তরস বা প্লাজমায় (Plasma) Rh বিরোধী উপাদান উৎপন্ন হয়। ফলে রক্ত গ্রহীতার দেহের রক্ত অত্যন্তসংবেদনশীল হয়ে ওঠে। প্রথমবার রক্তদানের জন্য গ্রহীতার দেহে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। তবে ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার ঐ ব্যক্তির দেহে Rh রক্ত দিলে প্রদত্ত রক্তের লোহিত কণিকা জড়িয়ে যায় ও লোহিত কণিকা বিনষ্ট হয়।

গর্ভবর্তী স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে Rh বিরোধী উপাদান খুব ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় তাই প্রথম সন্তানটি জন্মের পর সুস্থ থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার ঐ স্ত্রীলোক গর্ভবর্তী হলে জটিলতা দেখা দেয়। Rh বিরোধী অ্যান্টিবডি সৃষ্টির কারণে ভ্রূণের ক্ষতিসাধন হয় এমনকি ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে।

সতর্কতা

জরুরীভিত্তিতে রক্তশূন্যতা পুরণের জন্য রোগীর দেহে অন্য মানুষের রক্ত দিতে হয়। মনে রাখতে হবে কোনো অবস্থাতেই রক্তের গ্রুপ ও প্রকৃতি পরীক্ষা না করে তা প্রবেশ করানো যাবে না। ব্যক্তিক্রম হলে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি এমন কি রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকের রক্তের গ্রুপগুলোর নাম লিখুন

সারাংশ

- রক্ত এক ধরনের তরল যোজক কলা। রক্তরস এবং রক্ত কণিকার সমন্বয়ে রক্ত গঠিত।
- রক্তের রং লাল।
- রক্তের গ্রুপ চারটি– A, B, AB ও O।

রক্তরস ও সিরাজের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– রক্ত রসে রক্ত কণিকা থাকে কিন্তু সিরামে কোনো রক্ত কণিকা থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রক্ত কী দ্বারা গঠিত?
   ক) যোজক কলা খ) রক্ত রস
   গ) তরল কল ঘ) রক্তরস ও রক্তকণিকা

২. হিমোগে□াবিন রক্তের কোনো কণিকায় অবস্থিত?
   ক) শ্বেত কণিক খ) লোহিত কণিকা
   গ) রক্তরস ঘ) প্লাজমা

৩. নিচেরগুলো রক্তের গ্রুপ-
   i) A
   ii) B
   iii) C
   নিচের কোনো টি সঠিক?
   ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ রক্তের উপাদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রক্তের উপাদান কী তা বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন উপাদানের গঠন উল্লেখ করতে পারবেন;
- উপাদানগুলোর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ শিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	শ্বেত রক্তকণিকা, লোহিত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা

আগের পাঠে আমরা রক্ত, রক্তের প্রধান কাজ এবং রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে আমরা জানলাম। এ পাঠে আমরা রক্তের উপাদান, গঠন এবং এদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবো।

রক্ত এক প্রকার যোজক কলা। এর অন্ত:কোষ মাধ্যমটি তরল, হলুদ বর্ণের জলীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। এ তরল পদার্থকে প্লাজমা বা রক্তরস বলে। এ প্লাজমার মধ্যে রক্তকণিকাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে। রক্তরে দুটি উপাদান– (১) রক্তরস এবং (২) রক্তকণিকা। সমগ্র রক্তের ৫৫% রক্তরস এবং বাকি ৪৫% রক্তকণিকা। রক্তকণিকা প্রধানত তিন রকম, যথা– লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা।

রক্তরস: রক্তের তরল অংশকে প্লাজমা বলে। রক্তরসের প্রায় ৯০% জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
জৈব পদার্থগুলো হলো–

- ❖ খাদ্যসার (গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, ইত্যাদি)।
- ❖ রেচন পদার্থ (ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইত্যাদি)।
- ❖ প্রোটিন (ফিব্রিনোজেন, গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন, ইত্যাদি)।
- ❖ প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি (অ্যান্টিটক্সিন)।

এছাড়াও রয়েছে হরমোন, কোলেস্টেরল, বিলিরুবিন, ইত্যাদি।

অজৈব পদার্থের মধ্যে রয়েছে– সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আয়োডিন, এবং গ্যাসীয় পদার্থ-O_2, CO_2, N_2, ইত্যাদি।

রক্তরসের কাজ

- ❖ রক্তকণিকাসহ রক্তরসে দ্রবীভূত খাদ্যসার দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে।
- ❖ বর্জ্য পদার্থ নির্গত করে রেচনের জন্য বৃক্কে পরিবহন করে।
- ❖ শ্বসনের ফলে কোষে সৃষ্ট CO_2 কে বাইকার্বনেট হিসেবে ফুসফুসে পরিবহন করে।
- ❖ রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করে।

রক্তকণিকা

- ❖ রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন রকমের কোষকে রক্তকণিকা বলে। রক্তকণিকাগুলো প্রধানত তিন রকমের, যথা– (১) লোহিত রক্তকণিকা বা ইরাইথ্রোসাইট, (২) শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট এবং (৩) অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট।

লোহিত রক্তকণিকা

মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা দ্বি-অবতল, চাকতি আকৃতির এবং নিউক্লিয়াসবিহীন। এতে হিমোগে□াবিন নামক রঞ্জন পদার্থ থাকার কারণে লাল বর্ণের হয়। এজন্য এদের Red Blood Cell বা RBC বলে। লোহিত কণিকা প্রকৃতপক্ষে হিমোগে□াবিন ভর্তি ভাসমান ব্যাগ এবং চ্যাপ্টা আকৃতির। এ কারণে লোহিত কণিকা তার আকারের পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহনে সক্ষম।

লোহিত কণিকাগুলোর বিভাজন হয় না। এ কণিকাগুলো সার্বক্ষণিক অস্থিমজ্জার ভিতরে উৎপন্ন হয় এবং রক্তরসে চলে আসে। মানুষের লোহিত কণিকার আয়ু প্রায় চার মাস অর্থাৎ ১২০ দিন। অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণির ক্ষেত্রে লোহিত কণিকা প্লীহা (Spleen)-তে সঞ্চিত থাকে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এখান থেকে লোহিত কণিকা রক্তরসে সরবরাহ হয়।

মোটামুটি গড় হিসেবে : বিভিন্ন বয়সের মানব দেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হচ্ছে- ভ্রূণ দেহে: ৮০-৯০ লাখ, শিশুর দেহে: ৬০-৭০ লাখ, পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ দেহে: ৪.৫ - ৫.৫ লাখ এবং পূর্ণ বয়স্ক নারীর দেহে: ৪ - ৫ লাখ।

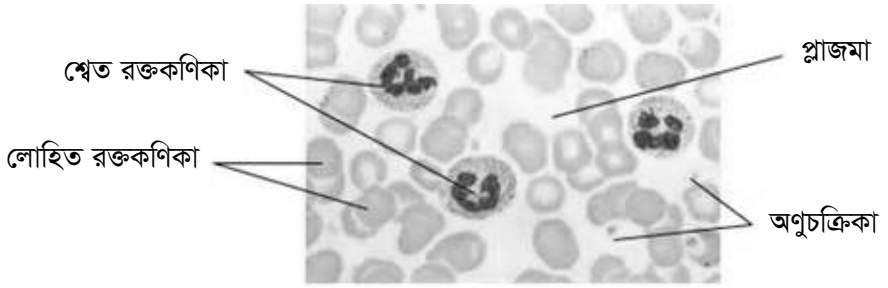

চিত্র ৩.২.১: মানুষের রক্তের উপাদান।

লোহিত কণিকার কাজ: লোহিত রক্তকণিকার প্রধান কাজ হলো–

- ❖ প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করা।
- ❖ নিষ্কাশনের জন্য কিছু পরিমাণ কার্বণ ডাই অক্সাইডকে বহন করা।
- ❖ রক্তের অম্ল–ক্ষারের সমতা বজায় রাখা।

শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট

শ্বেত কণিকার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এগুলো হিমোগ্লোবিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় আকারের কোষ। শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ১-১৫ দিন। হিমোগ্লোবিন না থাকার কারণে এদের শ্বেত রক্তকণিকা বলে। ইংরেজিতে White Blood Cell বা WBC বলে। রক্তে এদের সংখ্যা RBC এর তুলনায় অনেক কম। এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে। রক্ত জালিকার প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। শ্বেত কণিকাগুলো রক্তরসের মধ্যদিয়ে নিজেরাই চলতে পারে। দেহ বাইরের জীবাণু দ্বারা আক্রান্তহলে, দ্রুত শ্বেত কণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে ৪-১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে এর সংখ্যা বেড়ে যায়।

প্রকারভেদ

গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে শ্বেত কণিকাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়– যথা (ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট বা দানাবিহীন এবং (খ) গ্রানুলোসাইট বা দানাযুক্ত।

(ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট: এ ধরনের শ্বেত কণিকাগুলোর সাইটোপ্লাজম দানাহীন ও স্বচ্ছ। অ্যাগ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকা দুই রকমের, যথা– লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। দেহের লিম্ফনোড, টনসিল, প্লিহা, ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়। লিম্ফোসাইটগুলো ছোট কণিকা। মনোসাইট বড় কণিকা। কিন্তু এর নিউক্লিয়াস বড় বাকে অন্যদিকে তবে তার নিউক্লিয়াস ছোট ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার আবৃতির হয়। লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে এবং এই অ্যান্টিবডির দ্বারা দেহে প্রবেশ করা

রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। এভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে। Lymphocites রক্তে বৃদ্ধি তেমন ক্ষতির কারণ নয় তবে অতিরিক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি ক্যান্সারের লক্ষণ।

ইরাইথ্রোসাইটস থ্রোম্বোসাইটস

মনোসাইট বেসোফিল ইওসিনোফিল নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইট

(খ) গ্রানুলোসাইট: এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাযুক্ত। গ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকাগুলো নিউক্লিয়াসের আকৃতির ভিত্তিতে তিন প্রকার যথা– (১) নিউট্রোফিল (২) ইওসিনোফিল ও (৩) বেসোফিল।

নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে। ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টাসিন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে। বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতরে জমাট বাঁধতে বাধা দেয় না।

অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট

ইংরেজিতে এদেরকে প্লাটিলেট (Platelet) বলে। এগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা রড আকারের হতে পারে। এদের দানাদার এবং সাইটোপ্লাজমে কোষ অঙ্গাণু-মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু থাকে, কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেকের মতে, অণুচক্রিকাগুলো সম্পূর্ণ কোষ নয়, এগুলো অস্থি-মজ্জার বৃহদাকার কোষের ছিন্ন অংশ। অণুচক্রিকাগুলোর গড় আয়ু ৫-১০ দিন। পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। অসুস্থদেহে এদের সংখ্যা আরও বেশি হয়।

রক্ত উপাদানের অস্বাভাবিক অবস্থা

মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য ঘটলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা বলা হয়। যেমন–

১. **অ্যানিমিয়া :** লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায় অথবা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কমে যায়।

২. **পলিসাইথিমিয়া :** লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

৩. **লিউকোসাইটোসিস :** শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থার মান থেকে বেড়ে যদি ১ ঘন মি.লি. রক্তে ২০,০০০-৩০,০০০ হয়।

৪. **লিউকেমিয়া :** নিউমোনিয়া, প্লেগ, কলেরা, প্রভৃতি রোগে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি শ্বেত কণিকার সংখ্যা অত্যাধিক হারে বেড়ে ১ ঘন মি.লি. রক্তে ৫০,০০০-১,০০০,০০০ হয়, তাহলে তাকে লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে রক্তের অজৈব পদার্থের নামগুলো লিখুন

সারাংশ

রক্তের অন্তঃকোষ মাধ্যমটি তরল, হলুদ বর্ণের জলীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। এ তরল পদার্থকে প্লাজমা বা রক্তরস বলে। রক্ত কণিকা তিন রকম– লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অণুচক্রিকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রক্তের তরল হলুদ বর্ণের জলীয় পদার্থটির নাম কী?
   ক) যোজক কলা খ) রক্তরস
   গ) রক্তকণিকা ঘ) অ্যান্টিটক্সিন

২. নিচের কোনটি রক্তের অজৈব পদার্থ?
   ক) ক্লোরিন খ) ভিটামিন
   গ) গ্লুকোজ ঘ) অ্যামোনিয়া

৩. নিচেরগুলো রক্তের জৈব পদার্থ-
   i) গ্লুকোজ
   ii) ভিটামিন
   iii) অ্যামোনিয়া
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৩ রক্ত সঞ্চালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হৃদপিন্ড ও রক্তনালী কী তা বলতে পারবেন;
- হৃদপিন্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের রক্তনালীর পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রক্ত সঞ্চালনে হৃদপিন্ড ও রক্তনালীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হৃদপিন্ড, ধমনি, শিরা

রক্ত সঞ্চালন

এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা জেনেছি রক্ত সংবহনতন্ত্রের দ্বারা মেরুদন্ডী প্রাণিদের দেহে রক্ত সঞ্চালন হয়। মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অংশগুলো হলো হৃদপিন্ড এবং রক্তনালী। ধমনি, শিরা এবং কৈশিক-জালিকা এ তিন ধরনের রক্তবাহী নালীগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হৃদপিন্ডের সাথে যুক্ত থেকে রক্ত সঞ্চালনে অংশ নেয়। এগুলোর কাজ সম্বন্ধে জানার পূর্বে এগুলোর গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

হৃদপিন্ড

রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হৃদপিন্ড। এটা পাম্পের মতো কাজ করে, ফলে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত প্রবাহ সচল থাকে।
অবস্থান : হৃদপিন্ড বক্ষ গহ্বরে দুই ফুসফুসের মাঝখানে একই বাম দিকে অবস্থিত।

গঠন : মানব হৃদপিন্ড সম্পূর্ণভাবে চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এর উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি বাম ও ডান অলিন্দ এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটি বাম ও ডান নিলয় নামে পরিচিত। নিলয় অলিন্দের তুলনায় আকারে বড়, প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। প্রকোষ্ঠ বিভক্ত থাকলেও গোটা হৃদপিন্ড একটি একক হিসাবে কাজ করে এবং পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। পেরিকার্ডিয়াম মূলতঃ দ্বিস্তরবিশিষ্ট। এর বাইরে স্তরকে প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়াম ও ভিতরের স্তরটিকে ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম বলে। দু স্তরের মধ্যবর্তী স্থানে পেরিকার্ডিয়াল রস থাকে। এ রস তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে হৃদপিন্ড কে রক্ষা করে।
হৃদপিন্ড এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। হৃদপিণ্ডের পেশি তিন বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যান্য পেশিসমূহ থেকে স্বতন্ত্র। বৈশিষ্ট্যগুলি– (১) একটি নির্দিষ্ট ছন্দে (rhythm) সংকোচন ও প্রসারন ঘটে, (২) পেশিগুলি জালি করে ন্যায় (অন্যান্য পেশিগুলি সমান্তরাল) ও (৩) পেশিগুলি কখনো ক্লান্তহয় না। অলিন্দ ও নিলয় যে পর্দা দ্বারা বিভক্ত থাকে তাদের যথাক্রমে আন্ত:অলিন্দ পর্দা এবং আন্ত: নিলয় পর্দা বলা হয়। ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দের সংযোগস্থলে ট্রাইকসপিড ভালভ থাকে, আর বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথে থাকে বাইকসপিড ভালভ। এ উভয় ধরনের কপাটিকা ভালভ নিলয়ের প্যাপিলারি পেশির সঙ্গে কর্ডি টেন্ডিনি নামক সূত্র দ্বারা যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে উদ্ভুত ফুসফুসীয় ধমণীর ছিদ্রপথে এবং বাম নিলয় থেকে উদ্ভুত আওর্টা মুখে যেসব কপাটিকা থাকে সেগুলো সেমিলুনার কপাটিকা নামে পরিচিত। কপাটিকাগুলো রক্তকে সম্মুখ দিকে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে এবং পিছন দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়।

হৃদপিন্ড প্রাচীর তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত

১. **এপিকার্ডিয়াম বা বহিঃস্তর :** এটা হৃদপিন্ডের সবচেয়ে বাইরের স্তর। এ স্তরটি যোজক কলা (Tissue) সমন্বয়ে গঠিত এবং স্তরের সঙ্গে প্রায়ই চর্বি লেগে থাকে।

২. **মায়োকার্ডিয়াম বা মধ্যস্তর :** হৃদপিন্ডের মাঝের স্তরকে মধ্যস্তর বলে। হৃদপিন্ডের এ স্তরটি পুরু এবং সংকোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩. **এন্ডোকার্ডিয়াম বা অন্তঃস্তর :** হৃদপিন্ডের ভিতরের স্তরকে অন্তঃস্তর বলে। এটা হৃদপিন্ডের প্রকোষ্ঠ এবং কপাটিকাগুলোকে আবৃত করে রাখে।

ধমনি

যে সব রক্তনালির মাধ্যমে রক্ত হৃদপিন্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয়, তাকে ধমনি বা আর্টারি (Artory) বলে। ধমনির প্রাচীর পুরু এবং তিনটি স্তরে গঠিত। এদের গহ্বর (Lumen) ছোট। ধমনিতে কোনো কপাটিকা থাকে না। ফলে ধমনি দিয়ে রক্ত বেগে প্রবাহিত হয়।

ধমনির স্পন্দন আছে। ধমনি দেহের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়, এদের শাখা ধমনি (Arteriol) বলে। এগুলো ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। এভাবে ধমনি হৃদপিন্ড থেকে শুরু হয়ে কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। ধমনির মাধ্যমে হৃদপিন্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশ অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয়। তবে ব্যতিক্রম হলো পালমোনারি ধমনি যা কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) যুক্ত রক্ত হৃদপিন্ড থেকে ফুসফুসে নিয়ে আসে এবং Umbilical artery CO_2 যুক্ত রক্ত ভ্রূণ থেকে মাতৃদেহে নিয়ে আসে।

শিরা

যে সব রক্তনালীর মাধ্যমে সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ডে বহন করে নিয়ে আসে, তাদের শিরা বলে। ব্যতিক্রম পালমোনারি শিরাটি ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিন্ডে নিয়ে আসে এবং Umbilical Vein মাতৃদেহ থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ভ্রূণে নিয়ে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা ও গহ্বর বড়। শিরায় কপাটিকা থাকায় শিরা দিয়ে রক্ত ধীরে ধীরে একমুখে প্রবাহিত হয়।

ধমনি প্রান্তের কৌশিক জালিকাগুলো ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শিরা বা উপশিরা গঠন করে। উপশিরাগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে পরে শিরা গঠন করে। কতগুলো শিরা মিলে মহাশিরা গঠন করে। এভাবে শিরা কৈশিক জালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃৎপিন্ডে শেষ হয়।

কৈশিক জালিকা: ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে অবস্থিত কেবল এক স্তর বিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়াম দিয়ে গঠিত যে সব সূক্ষ্ম রক্তনালি জালিকা আকারে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে কৈশিক জালিকা বলে। কৈশিক জালিকার মাধ্যমে রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা পুষ্টিদ্রব্য, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, রেচন পদার্থ, ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে।

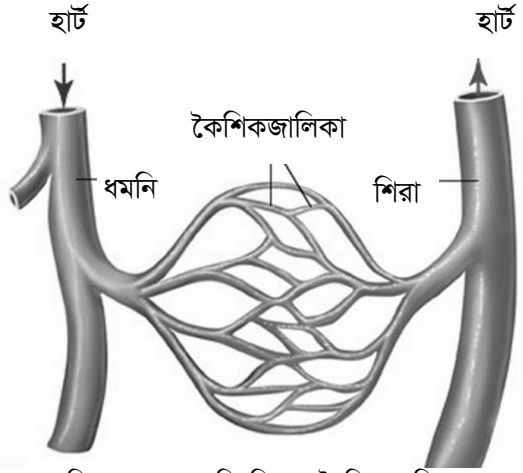

চিত্র: ৩.৩.১: ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা

রক্ত সঞ্চালন

মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র হৃদপিন্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা নিয়ে গঠিত। মানুষের হৃদপিন্ড অবিরাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে ধমনি ও শিরার মাধ্যমে রক্ত পরিবহন করে। হৃদপিন্ডের স্বতঃস্ফুর্ত সংকোচনকে সিস্টোল (Systole) এবং স্বতঃস্ফুর্ত প্রসারণকে ডায়াস্টোল (Diastole) বলে। উল্লেখ্য, অলিন্দে যখন সিস্টোল হয়, নিলয়ে তখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে। মানুষের হৃদপিন্ডের রক্ত সংবহন নিম্নরূপে ঘটে–

১। অলিন্দদ্বয় যখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে তখন সারাদেহের CO_2 যুক্ত রক্ত উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দিয়ে ডান অলিন্দে আসে এবং ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে আসে।

২। অলিন্দে দুটি রক্তপূর্ণ হলে সেগুলো সংকুচিত হয়, অর্থাৎ অলিন্দের সিস্টোল হয়। ফলে ডান অলিন্দ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয় এবং বাম অলিন্দ থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এই সময় নিলয়দ্বয় ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে।

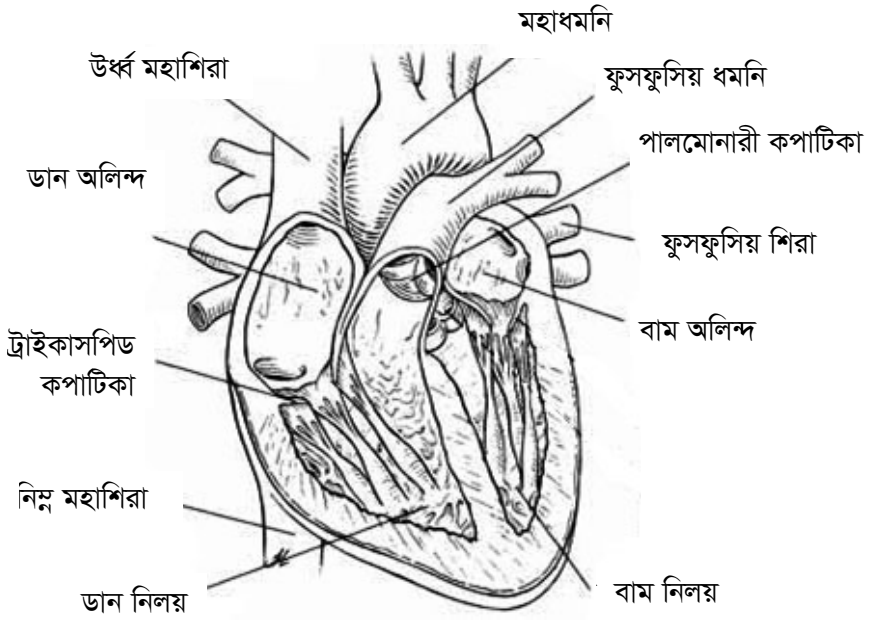

চিত্র ৩.৩.২: হৃদপিন্ডের লম্বচ্ছেদ।

৩। নিলয়দ্বয় রক্তপূর্ণ হলে সেগুলো সংকুচিত হয়, অর্থাৎ নিলয়ে সিস্টোল হয়।

এ সময় বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত (O_2 যুক্ত রক্ত) মহাধমনি এবং ডান নিলয় থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। মহাধমনি থেকে রক্ত বিভিন্ন ধমনি ও শাখা ধমনি দিয়ে দেহস্থ বিভিন্ন জালিকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং কলাকোষকে পুষ্টিদ্রব্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। অপরপক্ষে ফুসফুসিয় ধমনি থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসিয় জালিকায় প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে পালমোনারি শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে আসে। অপরপক্ষে সারা দেহস্থ রক্ত জালিকা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্ত (দূষিত রক্ত) উপশিরা, শিরা ও মহাশিরা দিয়ে পুনরায় অলিন্দে ফিরে আসে। হৃদপিন্ড পাম্প যন্ত্রের মতো নির্দিষ্ট তালে ও ছন্দে সংকুচিত হয়ে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়।

এভাবে হৃদপিন্ডের পর্যায়ক্রমে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের মাধ্যমে মানুষের দেহে রক্ত সংবহন হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মানব হৃদপিণ্ডের চিহ্নিত চিত্র একে ক্লাসে উপস্থাপন করুন

সারাংশ

- হৃদপিন্ড, শিরা, ধমনি ও কৈশিক জালিকা নিয়ে রক্ত সংবহণতন্ত্র গঠিত।
- এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত হৃদপিন্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।
- ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হৃদপিন্ড থেকে দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয়। তবে পালমোনারি ধমনি কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্ত হৃদপিন্ড থেকে ফুসফুসে নিয়ে আসে।
- শিরার মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃদপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে। তবে পালমোনারি নামের শিরাটি ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডে নিয়ে আসে।
- ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে অবস্থিত থেকে কৈশিক জালিকা রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপক প্রক্রিয়ার দ্বারা পুষ্টি দ্রব্য, অক্সিজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড, রেচন পদার্থ ইত্যাদির আদান প্রদান ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মানবদেহের কোনো অঙ্গটি বক্ষগহব্বরের বামদিকে দুই ফুসফুসের মাঝে অবস্থান করে?
   ক) প্লিহা খ) হৃদপিন্ড
   গ) নিলয় ঘ) অলিন্দ

২. কৈশিক জালিকা কী?
   ক) রক্তরস খ) ধমনি
   গ) রক্তনালী ঘ) শিরা

৩. হৃদপিণ্ডের প্রাচীরগুলো হল-
   i) এপিকার্ডিয়াম
   ii) মায়োকার্ডিয়াম
   iii) এন্ড্রোকার্ডিয়াম
   নিচের কোনো টি সঠিক?
   ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৪ হার্ট-বিট ও রক্তচাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হার্ট-বিট কী তা বলতে পারবেন;
- রক্তচাপ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রক্তচাপ নির্ণয় পদ্ধতি নিরূপণ করতে পারবেন;
- আদর্শ রক্তচাপ, হার্ট-বিট, হার্টরেইট (heart rate) এবং পালস্ রেইটের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন;
- রক্তচাপজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ ও প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডায়াস্টোল, সিস্টোল, উচ্চ রক্তচাপ

হার্ট-বিট

হৃদপিন্ড একটি পাম্প যন্ত্রের মতো। এটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মতো দেহের ভিতরে সর্বক্ষণ ছন্দের হারে স্পন্দিত হয়। হৃদপিন্ডের এই স্পন্দনকে হৃদস্পন্দন বা হার্ট-বিট বলে। এই হৃদস্পন্দনের মাধ্যমে হৃদপিন্ড আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহিত করে।

হার্ট-বিট বা হৃদস্পন্দন একটি জটিল বিষয়। মানুষের হৃদপিন্ড মায়োজেনিক (Myogenic) অর্থাৎ বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়া হৃদপেশি নিজে থেকে সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা হৃদস্পন্দন সৃষ্টি করে। একটি হৃদস্পন্দন হৃদপিন্ডে পর পর সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে কার্ডিয়াক চক্র বলে। হৃদপিন্ডের স্পন্দন অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের বারবার সংকোচন এবং প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভেতর গতিশীল থাকে। কার্ডিয়াক চক্র চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়–

১. **অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল:** এ সময় অ্যাট্রিয়াম দুটি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। ফলে দেহের রক্ত ডান ও বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।

২. **অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল:** অ্যাট্রিয়াম দুটি রক্তপূর্ণ হলে অ্যাট্রিয়াম দুটি সংকুচিত হয়। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা দিয়ে রক্ত ভেন্ট্রিকলে প্রেরিত হয়।

৩. **ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল:** ভেন্ট্রিকল দুটি সংকুচিত হয়। এ সময় ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ এবং সেমিলুনার কপাটিকা খোলা থাকে। ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের সময় টাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকাস, রক্তের ধাক্কা লেগে বন্ধের কারণে হৃৎস্পন্দনে প্রথম যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে 'লাব' (1^{st} Heart Sound LUB) বলে এবং সেমিলুনার কপাটিকায় পালমোনারী ধমনি ও এওটা থেকে ফিরে আসা রক্তের ধাক্কা লেগে বন্দের কারণে ২য় শব্দ 'Dub' উৎপন্ন হয়। এই দুইটি শব্দকে একত্রে yLub-Dab" বলে।

৪. **ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল:** ভেন্ট্রিকলে সিস্টোলের পর পরই ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল শুরু হয়। ডায়াস্টোলের সময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং অ্যাট্রিয়াস থেকে ডেন্ট্রিকলে আসে। সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধের সময় যে শব্দের সৃষ্টি তাকে 'ডাব' (DUBB, 2^{nd} Heart Sound) বলে।

সুতরাং হৃদপিন্ডের শব্দগুলো হলো–
ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল– লাব
ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল– ডাব

একটি সিস্টোল ও একটি ডায়াস্টোলের সমন্বয়ে একটি হৃদস্পন্দন সম্পন্ন হয় এবং সময় লাগে প্রায় ০.৮ সেকেন্ড। একজন সুস্থ মানুষের হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ সাধারণত গড়ে ৭০ বার হয়। এটাকে হার্ট-বিট বলা হয়। আমাদের হাতের কবজির রেডিয়াল ধমনিতে এই স্পন্দন গোনা যায় আবার বুকের বাম দিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্টেথেস্কোপের ডায়াফ্রাম বসিয়ে এবং এর নলের শেষ প্রান্তদুটি কানে লাগিয়েও এ শব্দ অনুভব করা যায়। হাতের কবজিতে হৃদস্পন্দন অনুভব করাকে পালস (Pulse) বলে। স্টেথেস্কোপের সাহায্যে যে হৃদস্পন্দন কোনো া যায়, তাকে হার্ট সাউন্ড (Heart Sound) বলে। হৃদস্পন্দন বা হার্ট-বিটকে যখন প্রতি মিনিটে হাতের কবজিতে গণনা করা হয়, তখন তাকে পালস্ রেইট বলা হয়।

হার্ট-বিট বা পালসরেইট গণনার পদ্ধতি

রোগীর হাতের কবজিতে হাতের তিন আঙ্গুল যেমন অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনি দিয়ে চাপ দিলে হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৮০ বার হয় তা অনুভব করা যায়। হাতের তিন আঙ্গুল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে তর্জনি থাকে হৃদপিন্ডের দিকে, মধ্যমা মাঝখানে এবং অনামিকা রোগীর হাতের আঙ্গুলের দিকে। এবার এক মিনিটে মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে বুঝা যাবে হাতের রেডিয়াম ধমনি কত বার ধুকধুক করছে। এটাই পালস রেট বা পালসের গতি। পালসকে আমরা সাধারণভাবে নাড়ী বলে থাকি।

বিশ্রামে থাকা অবস্থায় পালস্ বা হার্ট-বিটের স্বাভাবিক গতি (গড়ে ৭০ বার)–
প্রাপ্ত বয়স্ক: প্রতি মিনিটে ৬০–১০০ বার।
শিশুদের: প্রতি মিনিটে ১০–১৪০ বার।

চিত্র ৩.৪.১: নাড়ি দেখা

কবজিতে পালস্ না পাওয়া গেলে কণ্ঠনালীর পাশে হৃদস্পন্দন দেখা যোত পারে অথবা সরাসরি বুকে কান পেতে হার্ট সাউন্ড কোনো ার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে কোনো সাধারণ মানুষের পালসের গতি প্রতি মিনিটে কতবার হচ্ছে তা দেখা যায় উপরের বর্ণনা অনুসারে ব্যবস্থা নিলে। ঘড়ি ধরে পালসের গতি দেখতে হয়। সাধারণত পালসের গতি দ্রুত হয়– পরিশ্রম করলে, ঘাবড়ে গেলে, ভয় পেলে, তীব্র যন্ত্রণা হলে, জ্বর হলে। পালসের স্বাভাবিক গতি হলো প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ বার। এ গতি মিনিটে ১০০-এর অধিক হয় জ্বর ও শক অচেতনতা অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির অতি কার্যকারিতার কারণে। ফারেনহাইট তাপ বৃদ্ধির জন্য পালসের গতি প্রতি মিনিটে ১০ বার বাড়ে। পালসের গতি খুব দ্রুত, খুব মন্থর বা অনিয়ন্ত্রিত হলে বুঝতে হবে যে হৃদপিন্ডের সমস্যা আছে। প্রতি মিনিটে পালসের গতি ৬০-এর কম হলে পারে হার্ট ব্লকের বা জন্ডিসের কারণে।
স্বাভাবিকভাবে মানসিক উত্তেজনা, ব্যায়াম, সন্ধ্যার দিকে নবজাতকে পালসের গতি বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পালসের গতি অধিক হলেও তা স্বাভাবিক ভাবতে হবে। ঘুমানো অবস্থায় এবং রাতে সুনিদ্রার পর সকালে পালসের গতি ৬০ এর কম হতে পারে। এ অবস্থাটিকেও স্বাভাবিক ধরতে হবে।

রক্তচাপ
হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদপিন্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহকালে ধমনি প্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তচাপ বলে। তাই রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির রক্তচাপকেই বুঝায়। রক্তচাপ হৃদপিন্ডের

কার্যকারিতা, ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা এবং রক্তের ঘনত্ব ও পরিমাণের সঙ্গে সম্পর্কিত। সিস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে, তাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ এবং ডায়াস্টোল অবস্থায় যে চাপ থাকে, তাকে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলে। স্বাভাবিক এবং সুস্থ একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ১১০-১৪০ মিলিমিটার (mm Hg) এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ৬০-৯০ মিলিমিটার (mm Hg)। স্বাভাবিক রক্তচাপকে ১২০/৮০ (mm Hg) এভাবে প্রকাশ করা হয়। স্ফিগমোম্যানোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।

উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপকে ডাক্তারি ভাষায় হাইপারটেনশন (Hypertension) বলে। শরীর ও মনের স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তচাপ যদি বয়সের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপরে অবস্থান করতে থাকে, তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। রক্তের চাপ যদি কম থাকে তা হলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বলে। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদপিন্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমিন গাত্রে কোনো ব্যক্তির সিস্টোলিক রক্তচাপ যদি হয় সব সময় ১৬০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ বা তার বেশি এবং ডায়াস্টোলিক সব সময় ৯৫ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ বা তার বেশি থাকে, তবে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে বলা যায়। উত্তেজনা, চিন্তা, বিষন্নতা, নিদ্রাহীনতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রক্তচাপ সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে, তবে তাকে হাইপারটেনশন বলা যাবে না এবং এ অবস্থায় কোনো ওষুধরেও প্রয়োজন হয় না। উচ্চ রক্তচাপ বংশগত (Genetic High blood presere) হতে পারে। উচ্চরক্তচাপ ভীতির কোনো কারণ নয় তবে নিয়মিত ঔষধ সেবনে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

চাপ নির্ণয় পদ্ধতি

হৃদপিন্ড থেকে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনি প্রাচীরে যে চাপের সৃষ্টি করে তাকে রক্তচাপ বলে। হৃদপিন্ড একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (Systole) এবং ডায়াস্টোল (Diastole) বলে।

মানুষের রক্তচাপ প্রধানত অ্যাসকালটেটরি (Auscultatory) পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।
অ্যাসকালটেটরি বা শ্রুতি নির্ভর পদ্ধতি (Auscultatory Method)।

উপকরণ

১. স্ফিগমোম্যানোমিটা (Sphigmomanometer)
২. স্টেথোস্কোপ (Stethoscope)

কার্যপদ্ধতি

১. যে ব্যক্তির রক্তচাপ নির্ণয় করা হবে তাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে বা শায়িত করে তার উর্ধ্ব বাহুর (কনুই-এর কিছু উপরে) চারদিকে রক্তচাপ নির্ণয়ক যন্ত্রের বাহুবন্ধটিকে (Cuff) টান-টান করে বেধে দিতে হবে। যন্ত্রটিকে ব্যক্তিটির হৃদপিন্ডের সমতলে রাখতে হবে।
২. এখন স্টেথেস্কোপের চেস্ট-পিসটি বাহুবন্ধনের নিচে ব্রাকিয়াল ধমনির উপর রেখে স্টেথোস্কোপের মুক্ত প্রাপ্ত দুটিকে অর্থাৎ ইয়ার-পিস্ দুটিকে দুকানে লাগাতে হবে।
৩. এখন বায়ু পাম্পের স্ক্রুটি এঁটে পাম্প করে বাহুবন্ধের মধ্যে বায়ুচাপ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্রের ম্যানোমিটার পারদস্তম্ভ ২০০ মি.মি. পারদ চাপের সমান হয়।
৪. এখন বায়ু পাম্পের স্ক্রুটি আলগা করে ধীরে ধীরে ম্যানোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা কমাতে হবে এবং বিশেষ ধ্বনি কোনো ার অপেক্ষা করতে হবে।
৫. পারদস্তম্ভ নামার সময় প্রথম যে ধ্বনি বা শব্দ কোনো া যাবে তা সিস্টোলিক রক্তচাপের নির্দেশক। এ শব্দ ধারাবাহিকভাবে কিছুক্ষণ হবার পর বন্ধ হয়ে যাবে। শব্দ বন্ধ হওয়া ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের নির্দেশক। শব্দ শুরু ও বন্ধ হবার সময় ম্যানোমিটারে পারদস্তম্ভের উচ্চতা দেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

চিত্র ৩.৪.২ : স্টেথোস্কোপের বিভিন্ন অংশ

হাইপারটেনশন হওয়ার প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। তবে অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, মেদবহুল শরীর, অতিরিক্ত লবন খাওয়া, অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, ডায়াবেটিস, অস্থিরচিত্ত ও মানসিক চাপগ্রস্থ, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য ব্যক্তিদের মধ্যে এ রোগের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। হাইপারটেনশন রোগীদের যে সব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে। (১) স্ট্রোক, (২) প্যারালাইসিস, (৩) হৃদপিন্ড বড় হয়ে যাওয়া, (৪) হার্ট অ্যাটাক ও ফেইলিউর, (৫) বৃক্কের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া, (৬) দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত কিডনীর কার্যকারিতা নষ্ট হওয়া প্রভৃতি। নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মতো মারাত্মক নয়। তবে রক্তচাপ যথেষ্ট কমে গেলে নানা রকম অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

রক্তচাপ প্রতিরোধ করার জন্য কিংবা প্রতিকার হিসেবে নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক উপায়গুলো পালনের মাধ্যমে উপকার পাওয়া যায়:

১. ডায়াবেটিস যদি থাকে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা।
২. দেহের ওজন বৃদ্ধি না করা।
৩. চর্বিযুক্ত খাদ্য বর্জন করা। যেমন– ঘি, মাখন, গরু ও খাসির মাংস, চিংড়ি যতটা সম্ভব বর্জন করা।
৪. সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
৫. পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৬. মদ্যপান এবং ধূমপান থেকে বিরতে থাকা।
৭. নিয়মিত ব্যায়াম করা।
৮. ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানো।
৯. মানসিক চাপমুক্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা।
১০. খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
১১. চিকিৎসকের পরামর্শ মত জীবন পরিচালনা করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে রক্তচাপ প্রতিরোধ করার ৫টি উপায় লিখুন			

সারাংশ

- হৃদপিন্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পযন্ত্রের মতো দেহের ভিতরে সর্বক্ষণ স্পন্দের মতো স্পন্দিত হয়। হৃদপিণ্ডের এই স্পন্দনকে হৃদস্পন্দন বা হার্ট-বিট বলে।
- হৃদপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারনের ফলে হৃদপিন্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহকালে ধমনি প্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্ত চাপ বলে।
- হৃদপিন্ড একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (Systole) এবং ডায়াস্টোল (Diastole) বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হৃদপিন্ডের অলিন্দের প্রসারণকে কী বলা হয়?
ক) সিস্টোন খ) মায়োজেনিক
গ) ডায়াস্টোল ঘ) স্পন্দন

২। বিশ্রামে থাকা অবস্থায় পালস এর স্বাভাবিক গতি-
i) প্রাপ্ত বয়স্ক- প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ বার
ii) শিশুদের- প্রতি মিনিটে ১০-১৪০ বার
iii) প্রাপ্ত বয়স্ক- প্রতি সেকেন্ডে ৬০-১০০ বার
নিচের কোনো টি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। হৃদপিন্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহকালে ধমনির প্রাচীর যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয় তাকে কী বলা হয়?
ক) সিস্টোলিক চাপ খ) ডায়াস্টোলিক চাপ
গ) রক্তচাপ ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৩.৫ হৃদরোগ ও এর প্রতিকার এবং ডায়াবেটিস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হৃদরোগের কারণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হৃদরোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন;
- ডায়াবেটিস কী তা বলতে পারবেন;
- ডায়াবেটিস রোগীর লক্ষণ ও পথ্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের উপায় শিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কোলেস্টেরল, হার্ট অ্যাটাক, ইসিজি, বহুমূত্র

বক্ষ গহবরের বাম দিকে ফুসফুসের মাঝখানে অবিস্থত হৃদপিন্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। এর সাহায্যেই সংবহনতন্ত্রের রক্ত প্রবাহ সচল থাকে। বিভিন্ন কারণে এই রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হতে পারে আর তখনই হৃদরোগের সৃষ্টি হয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল :

কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল এক বিশেষ ধরনের জটিল স্নেহ পদার্থ। ইহা প্রাণি কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের প্রায় প্রত্যেক কোষ ও কলাতে (Tissue) কোলেস্টেরল থাকে। যকৃৎ ও মগজে এর পরিমাণ বেশি। লাইপোপ্রোটিন নামক যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। স্নেহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে লাইপোপ্রোটিন দুই রকম– উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (High Density Lipoprotein HDL) এবং নিম্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (Low Density Lipoprotein- LDL)। রক্তের LDL এর পরিমাণের বৃদ্ধির সাথে কোলেস্টেরলের আধিক্যের সম্পর্ক আছে। রক্তে LDL এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। রক্তে HDL এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য উপকারী। রক্তে কোলেস্টেরল এর স্বাভাবিক পরিমাণ ১০০–২০০ mg/dl।

রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য হৃদ রোগের আশংকা বাড়ায়। স্বাভাবিক মাত্রা থেকে রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে রক্তনালীর অন্তঃপ্রাচীরের গাত্রে কোলেস্টেরল ও ক্যালসিয়াম জমা হয়ে রক্ত নালি গহ্বর সংকুচিত হয়। ফলে ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়– এ অবস্থাকে ধমনির কাঠিন্য বা Arteriosclerosis বলে। আর্টারিওস্ক্লেরোসিস এর কারণে ধমনির প্রাচীরে ফাটল দেখা দিতে পারে। ধমনিগাত্রের ফাটল দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়ে জমাট বাঁধার কারণে রক্ত প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। হৃদপিন্ডের করোনারি রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে করোনারি থ্রম্বোসিস বলে এবং মস্তিকের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বলে। এতে আক্রান্তব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে।

হার্ট ব্লকঃ হৃদপিন্ডের স্পন্দন প্রবাহ উৎপাদন ত্রুটিপূর্ণ হলে বা উৎপন্ন প্রবাহ সঠিক পথে পরিবাহিত না হলে তাকে হৃদ অবরোধ বা হার্ট ব্লক বলে।

হার্ট অ্যাটাকঃ হৃদপিন্ডের করোনারি ধমনি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে হৃদপেশির রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে।

হার্ট ফেইলিউরঃ হৃদপিন্ডের অ্যাট্রিয়াম অথবা ভেন্ট্রিকল অথবা উভয়ের সংকোচন ক্ষমতা লোপ পাওয়াকে হার্ট ফেলিওর বলে।

ইসিজি (ECG): হৃদপিন্ডে যখন স্পন্দন চলে তখন হৃদপিন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের পেশি থেকে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রাফ কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই লেখচিত্রই হল ECG (Electro Cardiography)। যে যন্ত্রের সাহায্যে হৃদপেন্ডির ক্রিয়া পদ্ধতি রেকর্ড করা হয় তাকে Electro Cardiograph বলে।

হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখার উপায়

আমরা সবাই জানি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন সুষম খাদ্য গ্রহণ ব্যায়াম ও বিশ্রাম। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা যেমন আবশ্যক তেমনি খাদ্য গ্রহণ এবং জীবন প্রণালি সম্বন্ধে কতগুলো সুঅভ্যাস গড়ে তোলাও একান্তআবশ্যক। অনেক কারণে দেহে রোগ হতে পারে। তবে সঠিক খাদ্য ব্যবস্থা এবং জীবন প্রণালি অনুসরণ করে হৃদযন্ত্রকে ঠিক রাখা যায়। সেগুলো হচ্ছে–

১. দেহের উচ্চতা ও বয়স অনুসারে কাংখিত ওজন বজায় রাখা আবশ্যক। দেহের ওজন বৃদ্ধি পেলে হৃদপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।
২. প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন মিশ্রিত খাবার খাওয়া উচিত।
৩. শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শাক–সবজি ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। উদ্ভিজ্জ তেল গ্রহণ করা উচিত। সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়। মাছ ভোজীদের হৃদরোগের প্রকোপ বেশ কম থাকে।
৪. ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা সুষম খাদ্যে যা আছে তা অপরিবর্তিত রাখা উচিত। তবে খাওয়ার লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। রসুন, তেঁতুল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল ও অন্যান্য ফল নিয়মিত খেলে হৃদরোগে আক্রান্তহওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে।

এগুলি ছাড়া সঠিক ও পরিমিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং অতিভোজন হতে বিরত থাকতে হবে। অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি এড়ানো, নিয়মিত হালকা ব্যায়াম অথবা হাঁটা, ধূমপান ও মদ পান থেকে বিরত থাকা সুষ্ঠু জীবনযাপন অর্থাৎ সময় মতো ঘুমানো, খাওয়ার অভ্যাস রাখলে হৃদরোগ ও উচ্চরক্ত চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ

ডায়াবেটিস এক প্রকার বিপাকজনিত রোগ। মানবদেহের রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ৮০–১২০ মি.গ্রা/ডেসি.লি। রক্তে যদি এ মাত্রা বেড়ে যায় তাহলে তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। এ রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ীভাবে বেড়ে যায়। ডায়াবেটিসে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের, যেমন হৃদপিন্ড, বৃক্ক, চোখ, ইত্যাদির স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে ডায়োবেটিস রোগীদের কারোনারি হৃদরোগ হওয়ায় প্রবণতা বেশি থাকে। যা হৃদপিন্ডকে অচল করে দেয় এবং রোগী স্ট্রোক হয়ে মারা যায়। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস রোগে রক্ত চাপ বেড়ে যায় এবং এর থেকে উচ্চ রক্ত চাপ বা হাইপারটেনশন হয়। উচ্চ রক্ত চাপ করোনারি হৃদরোগের পূর্ব লক্ষন। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকলে করোনারি হৃদরোগে আক্রান্তহওয়ার সম্বাবনা খুবই বেশি।

যে কেউ যে কোনো সময়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্তহতে পারে। তবে নিম্নলিখিত কারণে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি–

১. যাদের বংশে ডায়াবেটিস আছে।
২. যাদের ওজন বেশি এবং শরীর মেদবহুল।
৩. যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করে না।
৪. দীর্ঘদিন যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করে।
৫. যারা আঁশ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে না।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ

১. ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বিশেষ করে রাতে ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া।
২. খুব বেশি পিপাসা লাগা।
৩. বেশি ক্ষিদে পাওয়া এবং অতিমাত্রায় শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করা।
৪. যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া এবং শীর্ণতা।

৫. সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তিও দুর্বলতা বোধ করা।
৬. চামড়া শুকিয়ে যাওয়া।
৭. চোখে ঝাপসা দেখা।
৮. শরীরের কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে, দেরিতে শুকানো।

ডায়াবেটিস রোগীর পথ্য

ডায়াবেটিস রোগকে দমিয়ে রাখতে খাদ্যের ভূমিকা অসামান্য। ডায়াবেটিস রোগের জন্য ওষুধ সেবন করলেও রোগীকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নিয়ন্ত্রিত খাদ্য ব্যবস্থা না থাকলে ওষুধ সেবন করেও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। রোগীকে এমন খাদ্য দ্রব্য দিতে হবে যা তার ন্যূনতম ক্যালরির চাহিদা পূরণ করে এবং খাদ্যের দ্বারা রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করা বেড়ে না যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

ক. **ডায়াবেটিসের পথ্য নিয়ন্ত্রণঃ** মোটা লোকদের ডায়াবেটিস হলে তাদের ওজন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্তখাদ্য দ্রব্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। ডায়াবেটিস রোগীদের মিষ্টি খাওয়া চলবে না। তাদের এমন খাবার খাওয়া উচিত যা প্রোটিন সমৃদ্ধ আর যাতে শ্বেতসার কম থাকে।

খ. **ওষুধ সেবনঃ** সব ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীদের এ দু'টি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করলে রোগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। কিন্তু ইনসুলিন নির্ভর রোগীর ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনের দরকার হয়।

গ. **জীবন শৃঙ্খলাঃ** শৃঙ্খলা ডায়াবেটিস রোগীর জীবন কাঠি। সে কারণে নিম্নোক্ত বিষয়ে রোগীকে বিশেষ নজর দিতে হবে–

১. নিয়মিত ও পরিমাণ মতো সুষম খাবার খেতে হবে।
২. নিয়মিত ও পরিমাণ মতো ব্যায়াম করতে হবে।
৩. নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা এবং ফলাফল লিখে রাখতে হবে।
৪. মিষ্টি খাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়গুলো ক্লাসে উপস্থাপন করুন

সারাংশ

- হৃৎপিন্ডের সাহায্যে সংবহনতন্ত্রের রক্ত প্রবাহ সচল থাকে। যদি কোনো কারণে এই রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয় তখনই হৃদরোগের সৃষ্টি হয়। যেমন: হার্ট ব্লক, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর।
- হৃদপিন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের পেশি থেকে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রাফ কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই লেখ চিত্রই হল ECG (Electrco Cardiography)।
- মানবদেহের রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা (৮০-১২০ মি.গ্রা./ডেসিলি) যদি বেড়ে যায় তাহলে তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোলেস্টেরল কী?
   ক) প্রোটিন খ) স্নেহ
   গ) ফ্যাট ঘ) কার্বোহাইড্রেট

২. রক্তে কোলেস্টরলের স্বাভাবিক পরিমাণ কত?
   ক) ২০০-৪০০ mg/dl খ) ১৫০-২০০ mg/dl
   গ) ১০০-২০০ mg/dl ঘ) ১২০-২২০ mg/dl

৩. ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলো হলো-
   i) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
   ii) খুব বেশি পিপাসা অনুভব করা
   iii) চোখে ঝাপসা দেখা
   নিচের কোনো টি সঠিক?
   ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্তমূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। করিম মিয়া হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাবা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন করিমকে নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে, মিষ্টি জাতীয় সমস্ত খাবার থেকে নিজেকে বিরত রাখতে এবং মাঝে মাঝে ইনসুলিন নিতে বললেন।
   ক) ইসিজি এর পূর্ণরূপ লিখুন।
   খ) মানব দেহে রক্তের গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা কত?
   গ) করিম মিয়া যে রোগে ভুগছে তার লক্ষণগুলো লিখুন।
   ঘ) উক্ত রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব- বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১ : ১। ঘ ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪ : ১। গ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ